ছবি ফিরে দেখা হরপ্রসাদ মিত্র

ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
ছবি ফিরে দেখা
দেখা
ছবি ফিরে দেখা

B
891.441 8
M 697 C

B
891.4418
M 697 C

INDIAN INSTITUTE
OF
ADVANCED STUDY
LIBRARY, SHIMLA

CATALOGUED

Chobi phirey dekha

ছবি ফিরে দেখা

হরপ্রসাদ মিত্র

Haraprasad Mitra

Ananda Pub.

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

Kolkata

Library IIAS, Shimla
B 891.441 8 M 697 C
00111653

B
891.441 8
M 697 C

Indian Institute of Advanced Study
ACC NO 111653
DATE 26/6/03
SHIMLA

প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৯২

B 1392

প্রচ্ছদ প্রবীর সেন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১০·০০ 10/-

দিল্লী-প্রবাসী বন্ধু শ্রীপরিমল দত্ত
প্রিয়বরেষু

লেখকের কথা

প্রয়াত বন্ধু সন্তোষকুমার ঘোষ-কে আমার 'যা আছে, যা নেই' বইটি উৎসর্গ ক'রেছিলুম। দুর্ভাগ্যের কথা, সে-বই যখন ছাপা শেষ হোলো তখন তিনি আর নেই। আমার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয় আনন্দবাজার পত্রিকা আপিসেই, বোধ হয় ১৯৮৪-র অগস্টের শেষদিকে কোনোদিন। তিনি বলেছিলেন, 'কই আপনার 'যা আছে, যা নেই' কোথায়?' বলেছিলুম—ছাপা হচ্ছে খুবই ঢিমেতালে, বই বেরুলেই দিয়ে যাবো। সন্তোষ বলেছিলেন, 'বেশি দেরি হবে না আশা করি?'

কী ভেবে বলেছিলেন ওকথা? ভাবি। মনে মনে জবাবও পাই একরকম।

সন্তোষ-কে সেইদিনই বলেছিলুম—আমার এখন ছবি ফিরে দেখবার ঋতু। ছবি ফিরে দেখছি। শুনে হেসেছিলেন।

তারপর আরেক অধ্যায় এখন।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীকানাইলাল সরকারের আনুকূল্যে অতঃপর 'ছবি ফিরে দেখা'-র প্রেসকপি গুছিয়ে রাখবার আশা পাওয়া গেল। তাঁর সৌজন্যের পরিচয় বারবার পেয়েছি। তাঁকে আবার নমস্কার জানাই।

আনন্দ পাবলিশার্স-এর পক্ষে শ্রীযুক্ত বাদল বসু এই বইটির মুদ্রণে যে যত্ন নিয়েছেন সেজন্যে তাঁকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। ইতি

॥২৫-এ বৈশাখ, ১৩৯২॥

হরপ্রসাদ মিত্র

এই লেখকের অন্যান্য কবিতার বই

পৌত্তলিক ১৯৪০
ভ্রমণ ১৯৪১
তিমিরাভিসার ১৯৫৪
সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা ১৯৫৯
আশ্বিনের ফেরিওলা ১৯৬৩
সাঁকো থেকে দেখা ১৯৬৮
ঝাউয়ের শব্দ ১৯৭৩
হৃদয়ে চকিতে কে সে ১৯৭৪
রুশী কবিতা (অনুবাদ) ১৯৭৫
ইদানীং আমি ১৯৮১
যা আছে, যা নেই ১৯৮৪
ইত্যাদি।

সূচীপত্র

চাঁদ, ঢেউ, পাখি	৯
ছবি ফিরে দেখা	১০
হঠাৎ টিপু সুলতান	১২
পালানপুর থেকে রাজকোট	১৩
ফেরা	১৫
দুরারোগ্য	১৬
সুজাতপুরে—সিরাথুতে	১৭
ওকে ফিরতেই হবে	১৮
মন	১৯
পুরী	২০
জুড়ি	২১
তিলজলা	২২
দৃশ্য	২৩
শান্তিনিকেতনের পথে	২৪
পৌষমেলা	২৫
ইতি	২৬
চাঁদের অসুখ	২৭
ভেতরটা	২৯
দেয়ালটা	৩০
নিহিত	৩১
কবিতা-গল্প-নাটক	৩২
অপসরণ	৩৩
পথ	৩৪
অশান্ত	৩৫
অবিস্মরণ	৩৬
পাড়ি	৩৭
সমাধি	৩৮
সমতা	৩৯
রাত্রি	৪০
বুকের মধ্যে নদী	৪১

চৈতালি	৪২
অ্যানাবেল লী'র জন্যে	৪৩
বনফুল-কে	৪৪
আমি	৪৬
এই সময়	৪৭
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে	৪৮
গীতবিতান	৪৯
শেষ গাড়ি	৫০
এইসব দিনরাত	৫১
ভোগ	৫২
দক্ষিণায়ন	৫৩
জিমি ও আমি	৫৪
বাদ-প্রতিবাদ	৫৫
অপরিণাম	৫৬
নির্বাপণ	৫৭
স্মৃতি	৫৯
চা-সুন্দরী	৬০
সুরধাম	৬০
শক্তি	৬১
সীমান্ত	৬২
টুকরো	৬৩
ছায়াতরুর নিচে	৬৪
ডিজাইন	৬৫
পরিণামে	৬৬
তিনটে টিয়া	৬৭
ছন্নমতি	৬৮
অগোচরে	৬৯
সাধু-সন্ত	৭০
প্রশ্ন	৭১
নীল দোপাট্টা	৭২
হো-চি-মিন	৭২

চাঁদ, ঢেউ, পাখি

মেলে যদি কোনো দূরের রাস্তা
ছোটো গণ্ডীটা ভোলবার,
ভিজে বালি ছুঁয়ে হাঁটার আরাম,
জলের শব্দ শোনবার—
তাহলে কী হয়? কী হয়?
অন্তত হাওয়া বদ্‌লায়।

কতো ঢেউ করে তোলপাড় মিলে মিলে
ডানা মেলে দেওয়া সীগাল
দম্‌কা নেমেই সে-ঢেউয়ে দোলে—
তাহলে কী হয়? কী হয়?
অন্য কিছুই নাও যদি ঘটে,
অন্তত হাওয়া বদ্‌লায়।

শেষরাতে উঠে জান্‌লা খুলেই
আধঘুমন্ত চাওয়া—
ভূর্ভুবস্ব বল্‌তে বল্‌তে শরীরে আরাম পাওয়া,
নাকে মুখে চোখে জননীধরণী লাগে,
গাছে গাছে পাখি জাগে।
তাদের চকিত কূজনের আগে আগে
হলুদ চাঁদটা টল্‌তে টল্‌তে চম্‌কায়।
আমাকেই দেখে পশ্চিমে ঝুঁকে
হঠাৎ আকাশে থম্‌কায়।

১৯৮৪

ছবি ফিরে দেখা

ছবি ফিরে দেখা কেন? কেন ফিরে দেখা?
যে-পথ পেরিয়ে গেছে সে-পথে কেই বা ফেরে আর?
জীবন সম্মুখগতি—মূল থেকে ফুলে, বীজে, লয়ে।
বৃক্ষকে যে পুষ্টি দিয়ে পরিণত ক'রে অন্তর্হিত,
কোথায় খুঁজবে তাকে? সে তো শুধু দেশ নয়,—কাল।
কালের উজান স্রোতে ভাসি আমরা। কে তাকে ফেরাবে?

সে শুধু স্মৃতির জাল,—রূপ রঙ গন্ধ স্পর্শহীন।
বিস্ময়, নৈরাশ্য, সুখ, জলের কল্লোল, সূর্যতাপ—
এসব পকেটে নিয়ে ফেরা যায়না। বিদ্যমানতাকে
কখনো শুনিনি কোনো আলাদীন নিয়ে ফিরে গেছে
অভিযান শেষ ক'রে পুনরায় যাত্রাসূচনাতে।
ছবি ফিরে দেখা তেমনি মধ্যরাতে সূর্যের পিপাসা।

যতক্ষণ প্রাণবায়ু কাজ করে যথাযথ, তার
সরল তাৎপর্য শুধু সারল্যই, যতক্ষণ সে না বাধ্য করে
নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে পৌষের দুঃসহ ঠান্ডাতে।
দর্শনীয় শ্রবণীয় কিছুই কি রাখে অন্ধকার?
তুষারে আচ্ছন্ন শীতে মালভূমি যেমন তিব্বত,
সেরকম নিঃসঙ্গতা যদি কাউকে করে অধিকার
তখন ভেতরে জাগে কূটস্থ বোধের মতো কিছু
অভ্যস্ত 'আমি'র ক্ষয়, লোপ,—যাকে বলে রূপান্তর।

পিয়ানোর রীডে কেউ কোমল বা ললিত আঙুলে
বাজালে সিম্‌ফনি, মানে, অকথন গভীর প্রেরণা—
ঈশ্বর নিজেই হন অবতীর্ণ তেমন সংগীতে।
তখন শূন্যতা আর শূন্য নয়,—বাদক ও শ্রোতা
ভেদহীন অনন্যতা,—সেরকম দিব্য-একাত্মতা
অতিক্রান্ত দৃশ্যে, অঙ্কে, জীবননাট্যের রোমন্থনে
কখনো সম্ভব নয়। নিয়তি কঠিন নাট্যকার।
স্বেচ্ছাধীন নয় তাঁর স্বরচিত কোনো কুশীলব।

ছবি ফিরে দেখা তাই বৃথাই রূপের রূপকথা
অবাস্তব, অসংলগ্ন মায়া-মোহ, কেবলি কবিতা।

একজন রাজার সেই খেয়ালের গল্প মনে পড়ে—
মুচড়ে রাজগুম্ফ যিনি একদিন সভারত্নদের

বল্‌লেন,—'আচার্যবৃন্দ, সমর্পিণু সশ্রদ্ধ বিনতি—
দুরারোগ্য যন্ত্রণায় কেটে গেছে বিনিদ্র রজনী।
বহুধা বিতর্কে কোনো সমাধান মেলেনি প্রশ্নের—
এ বিশ্বে সর্বোচ্চ কে বা? বিধাতা—না ব্যর্থ এ নৃপতি?
নির্ভয়ে বলুন শুনি,—অন্তর মথিত কৌতূহলে;
আত্মিক সংকট যাক্ পণ্ডিতের শুভ প্রজ্ঞাবলে।'

রাজবাক্য শেষ হোলো। বুধবৃন্দ শিহরিত ত্রাসে।
বুধশিরোমণি যিনি উচ্চশির পলিত-মস্তক—
বল্‌লেন প্রশান্ত কণ্ঠে, 'মর্মপীড়া হবে নিরাময়।
ঈষৎ সময় চাই, আছে শাস্ত্রে এর সদুত্তর।
আগামী সপ্তাহে ঠিক এই লগ্নে এ-সভায় এসে
রাজসন্নিধানে হবে অভ্রান্ত মীমাংসা নিবেদন।'

'তথাস্তু' বল্‌লেন রাজা। পণ্ডিতেরা নিলেন বিদায়।
রাজপথে এসে যুবাপণ্ডিতেরা করে 'হায়' 'হায়'।

সপ্তাহান্তে যথাকালে পুষ্পমাল্যে চন্দনে ভূষিত
প্রত্যাগত তাঁরা সব উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনিযোগে
শোনালেন—'হে নৃপতি, সৌম্যকান্তি, প্রজানুরঞ্জক;
কমলার বরপুত্র, বীরশ্রেষ্ঠ,—রাজ্যের ঈশ্বর,
শাস্ত্রবাক্য দ্বিধাহীন,—সংশয়ের হোক নিরসন,
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ব্রহ্ম। রাজ্যে কিন্তু রাজা সর্বক্ষম।'

করতালি, জয়ধ্বনি, শঙ্খনাদ, সানাই ও ভেরী
নিনাদিত মুহুর্মুহু। লাজাঞ্জলি, সুগন্ধির ঝারি
বর্ষিত অজস্র ধারে, সুখহাস্যে আনন্দিত সভা।
নৃপতি প্রসন্ন, তবু চিত্তে তাঁর সংশয়ের কাঁটা—
বল্‌লেন, 'হোলো না স্পষ্ট বিধাতার সঙ্গে ভেদ কোথা?
মান্যবর জ্ঞানরত্ন, শাস্ত্রবাক্যে নেই সরলতা?'

প্রবীণ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বল্‌লেন—'সরলার্থ এই—
মহীপতি সর্বক্ষম, যথাইচ্ছা রক্ষক, পালক।
যে-কোনো প্রজারই তিনি পুরস্কার কিংবা দণ্ড-দাতা।
তৃণাগ্রমাত্রেরও কিন্তু নির্বাসনে অক্ষম বিধাতা।'

ছবি ফিরে দেখা তেমনি আদিঅন্তহীন নানা কথা—
দিবালোকে চন্দ্রালোকে অন্ধকারে সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা।

১৯৮৫

হঠাৎ টিপু সুলতান

দক্ষিণ-কেবিনের দিকে রেললাইনের সঙ্গে
রাস্তার কাটাকুটি যেদিকটায়
খাড়া এক তেজী গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল সেদিকে।

ইস্টিশন পড়ে রইলো রেললাইনের পাশে।
গুচ্ছ গুচ্ছ স্কার্লেট-বেল রইলো সাড়ে-নটা বেলার রোদে।
রুমাল উড়লো। হর্ন বাজলো। মোটরের দরজা লক্ করা হোলো।
তারপর মহীশূর পড়ে রইলো মহীশূর জংশনেই।

অনেক গির্জা আর হোটেল আর মসৃণ টারম্যাক।
সেই হাইওয়ে ধরে মাইল-দশেক।
তারপর টিপু সুলতান, হায়দার আলি।
আঠারোর শতকের শেষ বিশ বছরের
কিছু কিছু ঘটনার ছবি সামনেই।
সতেরো-শ' নিরানব্বুইয়ে শ্রীরঙ্গপত্তনে সূর্যাস্ত।

বিজয়নগরের মহিমার মধ্যাহ্নে
শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর মন্দির উঠেছিল।
সেখানে অনন্তশয়নে বিষ্ণু।
তারপর, চামুণ্ডা-মন্দিরের টিলায় দাঁড়ানো
বিশাল মহিষাসুর
—যার এক হাতে তলোয়ার,
অন্যহাতে সাপ।

পরপর অনেকটা গুছিয়ে রাখা গিয়েছিল যেসব দৃশ্য,
তাদের জোড় আলগা হয়ে যাচ্ছে—
কোথাও বেড়িয়ে আসবার পরে
পুরোনো আস্তানায় ফিরে যেমন ঘটে থাকে।

ঘড়ি মেলানো, খবরকাগজে নজর, সকালের জান্‌লায় ফেরিওলা।
—তারই মধ্যে দক্ষিণ-কেবিনের দিকে
মহীশূর-জংশনের সেই তেজী স্কার্লেট-বেল উঁকি দেয়,
এবং সেই সূত্রেই টিপু সুলতান।

১৯৮৫

পালানপুর থেকে রাজকোট

বিকেল চারটে, পোঁছোনো গেল পালানপুরে,
চন্দন-গাছ ভেবেছিলুম যা বাড়ির হাতায়,
চন্দন নয়, দেহাতী বুলিতে বলে 'সক্কড়'
চৌকিদারের মুখে সেই নামই শুনেছিলুম তো।
পম্‌ফ্রেট-ভাজা খেতে খেতে দেখা তিনটে ময়ূর
বেশ লেগেছিল এ-ডালে সে-ডালে হনুমানদেরও।

আড়াই-হাজার বছরের ক'টি কাঠের ফলক
খননলব্ধ—যাদুঘরে তারা যাবার যোগ্য।
সেসব সাজানো ছিল হাকিমের বসার ঘরে—
এবং আরব-সাগরে আহৃত বৃহৎ মুক্তো
আর, মার্বেল পাথরের ক'টি সুঠাম খণ্ড।
লাগোয়া সবজি-বাগানের ঝোপে পোষা খরগোস।

হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ দেখে ফেরা হোলো রাত-বারোটায়।
ঝিঁঝি ডেকেছিল; রাত্রি নিঝুম সেই বাংলোয়।

সেই একরাত কাটিয়ে পরের বিকেলের ট্রেনে
পোঁছোনো গেল রাত-আটটায় মহাসেনা জং।
গাড়িবদলের ঝক্কি পোহাতে হোলোই—এবং
ঘণ্টাকয়েক পরেই সে এক হিমহিম ভোরে
জ্বরে থম্‌থমে সর্বশরীর—এলো রাজকোট।

সেইখানে নেমে ইষ্টিশনের বিশ্রাম-ঘরে
গুজরাটী খানা খেতে হয়েছিল চাটনি-পাঁপর।
বাঙালীর জিভে শুক্তো পোস্তো বেগুনভাজা
কতো স্বাদ তাও বোঝা গিয়েছিল অভাবে পড়ে।

দুপুরে গরম,—জ্বরে নাজেহাল, তবু রাজকোট
ভালই লেগেছে,—পথে বেরিয়েছি বিকেল হতেই।
বাড়িগুলি বেশ ছিমছাম,—ঘরে দোল্‌না দোলে।
তাতে দোল্‌ খান নারী ও পুরুষ,—বাগানে বাহার।

হাঁটতে হাঁটতে জ্বর নেমে গেছে, হাল্‌কা শরীর।
খুঁজেছি কোথায় কোন্‌ পথে পাই অ্যালফ্রেড-স্কুল

যেখানে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন মহাত্মাজী।
সন্ধে হচ্ছে তখন ক্রমশ, তারিখটা ভাবি—
সেটা বহুদূর খ্রীষ্টাব্দের আঠারো-সাতাশি।

১৯৮০

ফেরা

মিল ছিল মনে মনে, সুখ ছিল হাওয়া।
জ্যোৎস্নায় পাপিয়ার ছিল গান গাওয়া।
ভোরের চাঁদের রঙ মধুর মতন,
রবিকরে উজ্জ্বল কতো কাঞ্চন।
শিউলি ঝ'র্‌তো সেই বাঁধানো উঠোনে,
নদীটির কলগান নদীটিই শোনে।

মাঝে মাঝে ফিরে আসে এখনো তারাই।
মনে হয়, সে-অতীতে হারাই হারাই।
কিন্তু হারানো নয় সহজ ব্যাপার।
সময়ের বিপরীতে কোথাও যাবার
উপায় জানে না দেহ, স্মৃতি একা একা
চকিতে অনেকদূর দিগন্তরেখা
ছুঁয়ে আসে বটে,—তবে, সে বড় বিষাদ।
সব প্রেম স'রে যায়—তফাৎ তফাৎ।

একটি জীবনে চেনা বিশ্বের রূপ
নয় মোটে সম্ভব,—বড়ো অদ্ভুত।
তাই বারে বারে ফেরা, মন বলে, তাই—
জন্ম মরণ প্রেম সবি ফিরে চাই।
প্রাণে মনে আত্মায় 'আমি' আর 'তুমি'—
শেষ প্রহরেও থাকে এই দুই ভূমি।

১৯৮৩

দুরারোগ্য

সমস্ত দেখবার চোখ মানুষের নয়।
কখনো এক ঝাঁক মেঘ, কখনো-বা দুরন্ত রোদ্দুর।
হাসি-কান্না সংসারের, মন্দিরের চূড়ায় পতাকা।
চৈতন্যচরিতামৃতপাঠ কোনো প্রসন্ন কণ্ঠে বা—
ছুরি ও পিস্তল পেটো অকস্মাৎ দুড়ুম্ দুড়ুম্,
ব্যাংকে ডাকাতি,—রাত্রে, কিংবা দিনে গৃহবধূ-খুন।
আসাম পাঞ্জাব লঙ্কা ত্রিপুরা দখল ক'রে যায়
উনিশ-শ'-তিরাশিতে কাগজের মোটা হেডলাইন।

সমুদ্রের কিনারায় নিরন্তর শোনা তোলপাড়
ঢেউয়ের উচ্ছল বেগ। লোনা জলে পা ডুবিয়ে হাঁটা।
ততোধিক কিবা আর?—এই, শুধু এই অনুমান—
অটুট আইনে বিশ্ব চিরদিন একই ভাবে বাঁধা।
যশ চাই, সোনা চাই, সবাই সম্রাট হতে চাই,
রমণীর প্রেম চাই নির্ভেজাল নন্দন-কানন।
কত সুখ পাওয়া যেতো, না-পাওয়া যে কতোটা ব্যর্থতা—
চিরকাল আছে এই দুরারোগ্য মনের অসুখ।

সমস্ত হৃদয় বুদ্ধি সম্পূর্ণ উজাড় ক'রে পাওয়া—
সে যে কী আবেগ, কী যে সমুদ্রের অপার বিস্তার
মানুষ জানে না, তাই মানুষেরা আসে আর যায়
ঘাসের মতন নিরুপায়।

১৯৮৩

সুজাতপুরে—সিরাথুতে

১. যখন সুজাতপুরে স্নান সেরে, বসে জান্‌লাতে
আজ মহা-অষ্টমীতে প্রণাম জানাই মা তোমাকে,
যমুনা পেরিয়ে এসে নাইনিতে ধান-গম-ক্ষেতে
কখনো অড়রফুলে প্রজাপতি হলুদবরণ
কখনো জনার-ক্ষেতে মা, তোমারই দেখি শ্রীচরণ!

২. মানুষ-মানুষ খেলা খেল্‌তে খেল্‌তে
অঙ্ক বাড়িয়ে যিনি যান—
বুঝিনা কী পরিণাম চান!

মানুষ দেখার সুখ আছে, ছিল, থাকবেও;
তবু—
সিরাথু ইস্টিশনে একথাই দেখা দেয় প্রভু।

নির্জন প্রান্তরে কেউ নেই।
ইচ্ছের সুষুপ্তি নয়,
—মন উদাসীন।
মনে পড়ে কতো ছায়া-দিন।

১৯৭৫

ওকে ফিরতেই হবে

আমি কে? আমি কোথায়? আমি কেন?—
ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ব্যস্তসমস্ত লোকটা পথে বেরিয়ে গেল।
কম কম শিউলি ফুটছে তখনো। অঘ্রানের হাওয়া বইছে মৃদু মৃদু।
রাস্তায় সকালের রোদ্দুর। জলকলে বাল্‌তির লাইন।
সব্‌জি-বাজারে মুলো-কপির বাজ্‌রা। হলুদ, চুনেহলুদ গাঁদা।
ঘেও কুকুরটার গলায় বকলশ তখনো—
কে কবে ত্যাজ্যপুত্তুর করেছে তাকে।
লিপস্টিকরঞ্জিতা মেয়েটার খুরের খুট্‌খুট্‌।
রেডিওতে গান্ধীকথা।

রোদ চ'ড়বে ক্রমেই।
লোকটা পাত্তাই দেয়নি সে-ভাবনাকে।
কিন্তু কিছুই ভাল লাগছেনা বল্‌লে
কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না।
বোধ-বুদ্ধি থাকলে সহাবস্থান মানতেই হয়।
'কতকটা রাখুন, অনেকটাই ছাড়ুন।'
—এসব কথায় কান না দিয়েই
রাস্তায় বেরিয়ে গেল লোকটা।

অথচ পেঁয়াজের মতন নিজের খোশা ছাড়াতে ছাড়াতে
নিজেকে শূন্য করে দেবার ইচ্ছেও এক পরৎ খোশা মাত্র।
যশের নেশা, টাকার বাজনা, কামের কামড় এই জীবন।
ফুঃ! যাবে কোথায় লোকটা?

১৯৮৩

কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া রাস্তার দুপাশে সারি বাঁধা
    কী এক বেগুনী পুষ্পস্তবকেরা লালে ও হলুদে
        মিলে মিশে উচ্ছ্বসিত—
গরু চরে উধাও জমিতে।

একঝাড় কলাগাছ, তিনটি উড়ন্ত টিয়া, আর—
    কালো কালো ফোঁটা যেন সেই মাঠে দশটি ছাগল।
পাঁচিলে বেষ্টিত আছে সুরক্ষিত ঝাঁ-ঝাঁ এক মাঠ।

আমার ঘড়ির কাঁটা চল্‌ছে না ঠিক।
    ভোরের নক্ষত্র জ্বলে যে-সময়ে
        তখন দশটা।
সন্ধ্যাতারা এলে দেখি
        বেজেছে বারোটা।
তাই ঘড়ি না দেখেই দেখা, শোনা, পাওয়া, আর হওয়া
    সমস্ত জীবনবোধ দুঃখ-সুখ একা-একা সওয়া।

দুঃখ—সে বিভ্রম, কিংবা আপনাতে অতি মনোযোগ,
মনকে শায়েস্তা করলে বোঝা যায় মন কী যে রোগ।

১৯৮১

পুরী

সহজ শ্বাসের সে যে কী আরাম সাগরবালিতে হেঁটে
ঢেউ দেখে দেখে শাদা পাখিদের ডানার নিচে,
ফেনার মালার ভাঙা-গড়া যেন ঘুঙুরের বোল!
বোধের বেহালা যার হাতে তার সুরঝংকার
    শুনতে শুনতে তাকে দেখবার মিহি বাসনায়
    লোনা হাওয়া বুকে টানতে টানতে দু'পা ভিজে যায়।

জেলেরা জালের দড়ি টেনে টেনে ঘামছেই রোদে,
    সূর্য লাফিয়ে উঠছে ক্রমেই—তা কি জেলিফিশ
    কোনো ইন্দ্রিয়ে কিছু টের পায়?
        তা জানাই নেই।

তারা তাল-তাল যেন তালশাঁস,
        ঢেউয়ে সরে যায়।
চিক্‌চিক্‌ আহা রাশি রাশি এলো সার্ডিনের ঝাঁক।
    ছট্‌ফট্‌ ক'রে কয়েক মিনিটে মরে দলে দলে।
    ঝাউবনে ছায়া ডাইনে—এবং
        বাঁয়ে ধু ধু জল।

১৯৮৪

জুড়ি

আমার ভেতরে আমি—পেঁয়াজের খোশা আর খোশা।
কোথাও চূড়ান্ত কোনো শেষ পরিচয় কারো নেই।
—একথা বললুম সেই আয়নার 'আমি'-কে।
সে ম্লান হেসেই মুখ ফেরালো—এবং
চুপিচুপি বললে সে—শরীরটা লাগছে বেতালা।
—এই বলে ঠোঁটে লম্বা সিগারেট টিপে
ফশ্ ক'রে দেশলাই জেবলে ওড়ালো সে একগাল ধোঁয়া।

বই খুলে চোখ রেখে বইয়ের পাতায়
হাত রাখলো কিছুক্ষণ কপালে মাথায়।
'মেয়েটা পকেটমার'—মনে পড়লো সুদূর চীৎকার।
সে কবে ঘটেছে,—সেই স্মৃতি কেন বুকে আছে তার?
বাঁচাতে বিফল চেষ্টা করেছে সে,—বাঁচাতে পারেনি।
'মেয়েটা পকেটমার' বলেছিল দুর্ধর্ষ পাবলিক।

কোথাও সরলরেখা না পেয়ে সে ভারি নাজেহাল।
ঘাসের জাজিমে বিষ্টি দেখে তার পেঁয়াজ-হৃদয়
আয়নায় বিম্বিত হোলো, সে দেখলো আমাকে তখনি।
লুকোতে পারে কি তার ভেতরের মেঘ বা গুমোট?
কিংবা তার রোদ্দুরের ক্ষীণ রেখা,—নদীর পিপাসা?

সে আছে নজরবন্দী, আমিও সমান প্রতিযোগী—
দু'জনেই আমরণ দু'জনের অবিভাজ্য জুড়ি।

১৯৮৩

Indian Institute of Advanced Study
ACC NO. 111153
DATE 21/1/03
SHIMLA

তিলজলা

যেমন গরম, তেমনি বিষ্টি—
পরপর এই অনাসৃষ্টি।
পাঁচুই-ছউই জুন উনিশ শ' চুরাশি—
জলে জলে দুনিয়া কাবার।
ক্ষেত ডুবে যায়, মাগ্গি বাজার।
দাও, টাকা দাও এখ্খুনি লাখ-পঁচাশি।

গৌরী সেনের টাকায় টাকায়
কেউ মোটা হয়, কেউ মরে যায়।
কিন্তু তাতে কী এসে যায়—ধরণী?
আজ আছো, কাল থাকবে কিনা
সেসব চিন্তা সহায়হীনা।
লাস ভেসে যায়,—দেখছো লেনিন-সরণী?

ময়না ডোবে, ঘাটাল ডোবে, ইলামবাজার খানাকুল।
ছাতা ধরুন রেল-লাইনে। বিদ্যুৎ তো বাড়ন্তই।
সরকারী বাস বেরোয়নি,—কেউ বেরোয় এমন দুর্যোগে?
রান্নার গ্যাস কয়লা ঘুঁটে ফতুর,—সে তো ঘটেই তো!

এই ছড়াটা স্যাঁৎসেতে নয়,—ভিজে গোবর উতলা।
নামডাকে চায় ধন্য হতে, তাই হোলো এ তিলজলা।

১৯৮৪

দৃশ্য

রোদ্দুরে জাল শুকোচ্ছে জেলেরা।
অনেক মাছের টুকরো ঝুলছে দড়িতে,
দক্ষিণী ছেলেটা চুরুট টানছে
সমুদ্রের দিকে মুখ রেখে।

এই দৃশ্যের প্রত্যক্ষতার আড়ালে
আর-এক দৃশ্য উঁকি দেয়—
খানিকটা ঘাসবন,
তিনটে ছাগল বাঁধা আছে খুঁটিতে।
সকাল থেকে দুপুর অবধি
গলার দড়ি যতোদূর যেতে দেয়
তারি মধ্যে ঘাস চিবুচ্ছে তারা।

উদ্দীপনার টান নেই। ভেতরের দরজায় নেই ধাক্কা।
ছুটিতে বেড়াতে এসেছি।
আজ আছি, কাল থাকবো না।
ঝোড়ো বাতাসে বালি উড়ছে থেকে থেকে
রোদ্দুরে শুঁটকির গন্ধ।

১৯৭২

শান্তিনিকেতনের পথে

হুশ ক'রে উড়ে চলে গেল একটা ইষ্টিশান।
ওভারব্রিজে অ্যালুমিনিয়ম রঙ্ জ্বল্ছে।
নিমফুলের গন্ধ এক ঝলক
সকালের হাওয়ায়।

ফাঁকা দিনগুলো যেন সিগারেটের শূন্য প্যাকেট।
দুপুরের দিগন্তে খানিকটা রক্তের ছোপ—
মানে, কৃষ্ণচূড়ায় আগুন লেগেছে আবার।

স্বাধীনতার পরে তিনটি দশক প্রায় শেষ।
কিছু যুদ্ধ, মৃত্যু, বিচ্ছেদ, আশাভঙ্গ
নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে একই হুকে
—টিফিন কৌটো আর জলের বোতল
ঝুলছে যাতে।

পঁচিশে বৈশাখের পরে পঁচিশে বৈশাখের মালা
পেরিয়ে পেরিয়ে যাওয়া কেবলি।

হুশ্ ক'রে উড়ে চলে গেছে রবীন্দ্রনাথের আশি বছর—
এবং শান্তিনিকেতন এখন কোথাও নেই।

১৯৭৫

পৌষমেলা

এখনো কোনো বকুলবীথি আমলকির কুঞ্জে
শীতের হাওয়া লাগেই লাগে ঘন পাতার পুঞ্জে
ছাতিমতলা ভারি উতলা
এখনো তারি জন্যে
চুপ করার আছে সুযোগ নিরন্ত অরণ্যে।

পৃথিবী ভারি ব'দ্‌লে যায়, ব'দ্‌লে যায় হায় রে,
কিছু তো তবু থাকেই থাকে,—কে বলে সবি নশ্বর?
বিপুলা এই ধরণী কী যে অশেষ মনোহারিণী
নটরাজের রঙ্গশালা খোলাই আছে নিত্য।

আশ্রমের স্বপ্ন তাই সত্যি, ভারি সত্যি।
মেলা জমাই কিছুক্ষণ সুফী বাউল বৈষ্ণব।
কেনা-বেচার ফুর্তি আর বেঁচে থাকার শান্তি—
তাতেই প্রতি পৌষে এই অনন্তের উৎসব।

১৯৭৫

ইতি

আজ পঁচিশে বৈশাখের জন্যে উৎসবের শালু নয়,
দুধের মতন সাদা চাদর বিছিয়ে বসা।
কয়েকটি গান—প্রেমের, প্রকৃতির, পুজোর।
তারপর প্রতিদিনের চেনা রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরা।

মাঠের মধ্যে বাড়ি।
যা রোজগার করি তার তিনভাগ বাড়িওলা নেন।
টাকায় টাকা আনে মশাই—
প্রত্যেক বুদ্ধিমানই জানেন।

আমাদের রক্তের স্রোত যথাবিধি বহতা।
মজ্জায় দুর্নীতির ঘুণ, হাড়ে পোকা ধরেছে।
আহারাদি আছে বই কি,
পিল্ পিল্ করে বাড়ছে মনুষ্যসংখ্যা।

আজ পঁচিশে বৈশাখের জন্যে গুন্‌গুন্ ক'রছে হাওয়া,
ভেতরটা বার-বার ধোওয়া।
যা রোজগার করি তার বাকি একভাগেই সংস্কৃতি।
দু'একটি ভালোর অভিনয় দেখে
অবিশ্বাস বেড়েই যায়। এই ভাবেই ইতি।

১৯৮০

বাড়ি ফিরে, মিঠে জলে সমুদ্রের নুন ধুয়ে ফেলে
সবাই নিশ্চিন্ত হয় জবাকুসুমের গন্ধময়
পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যে, মানে আলোড়নরহিত আরামে।

কিছু চোরাবালি, কিছু নুন, কিছু ঝিনুকের কণা
স্বপ্নের মধ্যেও আসে,
ওরা কেউ নিঃশেষে যায়না।

কিছু প্রলম্বিত বেণী, আর গাঢ় ভুরুর ধনুক
চিবুকে নিশ্ছিদ্র তিল, নাসায় বেশর,
কঙ্কণের কিছু সোনা,—কোনো কোনো
অহল্যা বেহুলা।
ফুল, সুর, ধৈর্য, ক্ষমা
সেতার বাজিয়ে চ'লে গেলে
তখন আবার আমরা
সমুদ্রে কি ফিরিনা,—ফিরিনা ?

শব্দেরা বাজনদার; যে শোনে সে একান্ত নীরব।
সে ব'লে : করুক শব্দ পাখি, ঢেউ, মেঘেরা, মেয়েরা
শাড়ির খশ্‌খশ্‌ থাক, চুড়ির মধুর রিনিঠিনি
নাহ'লে জীবন শূন্য!
তা'বলে কি শব্দের সাগরে
চিরকাল থাকা যায় ?

সমুদ্রের লুপ্ত বালুতটে—
সে যায় বেড়াতে—সেই
যেখানে সমুদ্র নেই আর:
চ'লে যায়, স'রে যায় একা-একা সারনাথ-মূলে
উজ্জ্বল বৃশ্চিক দ্যাখে অন্ধকার ভুবনেশ্বরে।
শ্মশানে বাসরে ফুল,
ফুলে ফুলে বরণ, বিদায়।
সেইসব অনুষ্ঠানে সমুৎসুক দাঁড়ায় সে একা।
সমুদ্রের ফেনারাও চোখে তার ফুলের উচ্ছ্বাস।

ডুবেও সমাপ্তি নেই।
সে-ই জানে সে কতো অস্থির—
ক্ষীয়মান কৃষ্ণপক্ষে.

শুক্লপক্ষে পুনরুজ্জীবন।
তরঙ্গের ফণা সব
শব্দ সব
চাঁদের অসুখ।

১৯৭৫

ভেতরটা

এক-একটা দিন কেমন যেন—
সকালে রোদ্দুর
তেরছা আসে যথারীতি জান্‌লাতে।
কিন্তু শিশির আছে কি নেই,—কে জানে!
বেথ্‌লেহেমে কী ঘটেছে
কবেই বা,
সিদ্ধার্থের সিদ্ধির স্বাদ কী রকম
জানিনা তা,—সকল কথাই কেতাবে।

দশ-দিগন্তে খবরকাগজ করুক যতোই বকর-বকর
যেদিকে চাই, বেপরোয়া কালান্তর।

এক-একটা দিন টবের চন্দ্রমল্লিকায়
ভ্রমর হয়ে ওড়ে হৃদয় নিরুপায়।
সৃষ্টির স্রোত অফুরন্ত, তা বটে।
ভালবাসার রঙ ভুলে যায় ভেতরটা।
এবং সেসব দিনের চোরাবালিতে
ডুবতে ডুবতে যা থাকে তা অবিশ্বাস।

এক-একটা রাত বাজায় শোকের সারেঙ্গী
মিথ্যে সেসব তুক-তাল-ধুন—ছলনা।
যীশু খৃীষ্টের ক্রুসের কাঁটার রক্তকুসুম যেরকম
মিলিয়ে গিয়ে এখন কেবল কেকের খিদে, মদের ধুম—
মেয়েমানুষ জড়িয়ে ধরে খুন হয়ে যায় ভেতরটা।

১৯৮৪

দেয়ালটা

জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের মতে,
ছ'শো থেকে হাজার কোটি বছরের আয়ুষ্মান এই জগৎ—
এবং এমনো অনেক সূর্য তারা আছে
দশ হাজার কোটি বছরেরও বেশি যাদের পরমায়ু।

বিশাল কালসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে
নিজেকে দেখবার চেষ্টা একা একা।
অ্যালসেশিয়ানের ঘ্রাণশক্তি নাকি
মানুষের চেয়ে দশলক্ষগুণ বেশি।

আমাদের শরীরে হর্মোনের জোয়ার-ভাঁটা কেবলি।
বুদ্ধি দিশেহারা। অনুভব ঝাপ্‌শা হয়ে যায়।
অণুতম অণুর মতন ভূমার্টুমাও স্বাদহীন সংকেত শুধু।

হঠাৎ ছবি ফিরে দেখি
দেওঘরের বাগানে গুচ্ছ গুচ্ছ অশোক ফুটতো।
লম্বা খাড়া দুই ইউক্যালিপটাসের পাতায় পাতায় সুঘ্রাণ
মস্তো গোলাপ-বাগিচা, আর অড়হরের ক্ষেত।
ঝিক্‌ঝিক্‌ ট্রেন চ'ল্‌তো সকালে-বিকেলে।

বিশ শতকের শেষ দিকের ক্যালেণ্ডারের
পাতা উড়ছে ফরফর ক'রে।
চোখ বুজলে সেই অদৃশ্য দেয়ালটা দেখতে পাই।

১৯৮৪

নিহিত

মেক্‌সিকো-তে অগ্নুদ্‌গার—লাভার উৎক্ষেপণে
এই পৃথিবীর দেশ-মহাদেশ রাসায়নিক চাপে
আবহাওয়া দেয় বদ্‌লে, হঠাৎ হিমালয়ের হিমে
কঠিন কামড় কমে। প্রখর তাপ হয়ে যায় ঢিমে।

ছন্দের এই ঝনক্‌-ঝনক্‌ বাজনা কি যায় রোখা ?
হাওয়ার লড়াই শুনছে হৃদয় পালোয়ানী তাল ঠোকা।
যা যেখানে ঘটছে সবি দেখতে দেখতে চলা,
চোখ বুজে এর বাইরে যাবার চেষ্টাটা নিষ্ফলা।

যতোই বেহাল হোক্‌ দুনিয়া,
        আপদ ঘটুক যতো—
    তোমার বুকে আমার বুকে যতোই ঘটুক ক্ষত,
        আপন গহন কাজে
        সুর বাজে, সুর বাজে—
হাঁস চরে ঠিক,—শালিখ, ঘুঘু, ময়না, চড়ুই ডাকে।
        চাঁপার বনে চাঁপা—
        সুগন্ধে প্রাণ কাঁপা !
নাক বুজে যায় যখন,
        তখন গন্ধ কি যায় মাপা ?

১৯৮৩

কবিতা-গল্প-নাটক

কবিতা বানানো শক্ত যদিনা ভেতরে মেঘেরা ঝাম্‌রায়।
ছোটো ঘরটাতে আকাশ কোথায়?
আছি ঠাশাঠাশি—তাই না?
সুখ ও দুঃখ মামুলি।
চেষ্টাই নেই ধানের সবুজ
দুমুঠিতে ধরা আঁজলায়।

গল্পেরও জোড় মেলানো কঠিন যদিনা লোকের মেলাতে
ঘুরতে ঘুরতে ভাল লেগে যায়
মেতে ওঠা যায় খেলাতে।

নাটক তো নয় কবুতরদের বকম্‌-বকম্‌ ঠোঁট
টিকিট খরচা যৎসামান্য, মিলন-বিরহ-জোট;
না, না,—সেরকম নয়।
হাতুড়ি, নেহাই, হাঁপর, আগুন
মিল্‌লে নাটক হয়।

যেদিকে উজান বেগের ক্রমেই মন্দ মন্দ ক্ষয়—
স্বখাত সলিলে ডুবতে ডুবতে সকলেই পৌঁছোয়।
সেটা প্রাণহীন বিষাদ কিংবা অবসাদ
—যাই বলো,
গোধূলির আলো-আঁধারীতে দেখা
কামরাঙা, জলপাই।

১৯৮৩

অপসরণ

অশথ-গাছের নতুন পাতায় সবুজ আলোর ঢেউ।
তালগাছেরা লম্বা সেপাই, কৃষ্ণচূড়া লাল।
দুপুর যেন সময়হারা বালির সমুন্দুর—
আকাশ দেখে চোখ জ্বলে যায়
অয়মহং ভো।

কে আমি? কে আমি?—এই এক ঘূর্ণির পাক ঘোরে।
নাম-ধাম সব মুছে দেবার প্রহর আসে তেড়ে।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে গল্পের ঢেউ ভাঙে।
এক-যে ছিলেন তিনি, ক্রমেই যায়না দেখা তাঁকে।

১৯৭৭

পথ

পথটা পাহাড় ছুঁয়ে ক্রমে সব অন্যান্য পাহাড়ে
একা হিল্‌হিল্‌ ক'রে
উঠে গেছে দূরের আকাশে।
নিচের মানুষ আমরা
বহুদিন দেখেছি, হেঁটেছি;
কিন্তু উঠে স'রে যাওয়া পাতলা হাওয়াতে
দমবন্ধ যন্ত্রণায় কে বাড়াবে
সজ্ঞানে নিজেকে?

পথটা জলের নিচে মাঝে মাঝে
নক্ষত্র-খচিত।
নিস্তব্ধ রাত্রির কোনো অদ্ভুত শ্বাপদ মনে হয়।
নেমে যেতে চায় মন,
কিন্তু নামা কঠিন, কঠিন।
মৃত্যু বা নতুন জন্ম যাই হোক্‌—
অজানা বটেই।

পথটা কখনো ভারি ব্যক্তিগত নিহিত গতিই,
অর্জন, সঞ্চয়, লাভ, অফুরন্ত প্রভূত ক্ষতিই—
সে যেন প্রকীর্ণ নানা নিমন্ত্রণ এবং বিদায়
কেবলি হিল্‌হিল্‌ ক'রে দূরে সরে যায়।

১৯৭২

অশান্ত

আতপ্ত সকাল মেঘলা, মাঝে মাঝে দমকা বর্ষণ
এক ঝাঁক হলুদে ফুলে সুশোভিত ও-বাড়ির হাতা।
খাঁচায় মুনিয়া এক বাঁক-কাঁধে ফেরিওলা এসে
জংগলের আলো-ছায়া দিয়ে গেল ভাবের ঘরে কি?

কেউ কেউ আজো আছে, অনেকেই নেই, তবু কোনো
চিহ্ন থাকে, ছায়া থাকে, গন্ধ থাকে; নিমগাছের কাক
কাকে যে কেবলি ডাকে তাতে কোনো আবেশ ঘটবার
সম্ভাবনা ঘটবে যে, সেকথা কি আমিই জানতুম?

বেগুনি ডুরে শাড়ি যেন কেবলি আঁচলে শিউলি তোলে।
রোদ্দুরের আঁকিবুকি মন্দিরের বিশাল চত্বরে।
যেন এক ভরানদী ছলছল করেই সর্বদা,
তেমনি অস্থির স্বাদ এইসবি, তবু মৃত্যুহীন।

দর্শন অস্পষ্ট, আর চতুর্দিকে কী যে হট্টগোল,
শান্ত হওয়া সুকঠিন। এরই নাম মর্তের বন্ধন।

১৯৭৭

অবিস্মরণ

যদি কিছু চেয়ে থাকো, পেয়ে থাকো,—ভুলেও গেছ তা।
মানে, যে বল্লমটার খোঁচা লেগেছিল, তার ফলে—
ঘটেছিল রক্তপাত, ক্ষতটাও ছিল কিছুদিন,
কালের চিকিৎসাগুণে ঘটেও গিয়েছে নিরাময়।
নতুন ত্বকের স্তর প্রকৃতিই গজিয়ে দিয়েছে,
অর্থাৎ জীবন ঠিক এবম্বিধই—তাও জানো।

চেতনা ডুবিয়ে দেওয়া কোনো এক স্রোতের নিক্বণে
তরঙ্গিত হ'তে হ'তে সম্পূর্ণ নিদ্রিত হয় মন।
তখনো বোধের তলে থাকে বোধ শান্ত পারাবার ঃ
তেমনি এখনো বটে দেখা হয় তোমার আমার।

১৯৮২

পাড়ি

বকুলে বকুলে ওড়ে ভ্রমরেরা বিকেলে
মনের ভেতরে মন বলে—'বলো কী পেলে?'
ভাবের পাশেই ভাব শুধু ঢেউ ভাঙছেই—
জলের অতলে তল খোঁজবার ইচ্ছেই
কখনো ডোবায় প্রায় মরণের গুহাতে,
বেঁচে ফিরে আসা যেন সোনা পাওয়া দু'হাতে।
সে তো জড় ধাতু নয়,—উজ্জ্বল ফূর্তি।
নিজেরই কিশোরকাল ধরে নিজ মূর্তি।

পাতা-ঝিরিঝিরি কোনো ঝাউসারি-ঝালরে
আকাশের বিস্তার ঘোমটার আদরে
ছোটো-বড়ো টুক্‌রোয় ফালি-ফালি নীল্‌চে
সুখস্বপ্নেরা সব মিল্‌তে ও মিশ্‌তে—
এসে ছুঁয়ে যেতো যাকে, সে তো এই 'আমি' হে—
নিজেও জানেনা নিজে কোথা তার অন্ত।
ঘটনার পরে ঘটে ঘটনার ধন্দ।
নিজেকে অকস্মাৎ বোঝে সে অনন্ত!

বিকেলের নিরালায় ঘুঘু ডাকে ঘুঘু-কে।
সেই সুরমধুরিমা পান এক চুমুকে।
তারপরে অনুভবে যে তামসী রাত্রি
ফোটায় তারার ফুল—যারা দূরযাত্রী
দেশে-কালে-নিমিত্তে আলোকিত বন্ধন
তবু যেন সুর, যেন উধাও অবন্ধন,
অজানার পারে চির-অজানায় পাড়ি তার।
নিশ্চিত নির্ভয়ে পূর্ণেরই ধ্যান তার।

১৯৮৩

সমাধি

মন-কে রাখা হাঁসের মতন সন্তরমান সময়ে—
কঠিন বটে, কারণ এই-যে উপমা এও হচ্ছে না।
হাঁস কি থাকে নির্জলা? তার ঠোঁটে, পায়ে, পালকে
লাগছেই জল, লাগছে হাওয়া—অসংশ্লিষ্ট মোটেই না।

অনপেক্ষ নয় দুনিয়া। এই ভাবা যাক্ অন্তত
কোথাও কোনো বাধ্যতা নেই—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৃত্যুভয়,
প্রতাপলিপ্সা, প্রেমের স্বপ্ন ইত্যাদি যা দৃশ্যমান—
সেসব যেন নদী, পাহাড়, কাকের ওড়া, বাঘের ডাক।

আমি আছি আমার মধ্যে—সেটাই স্বয়ংপূর্ণতা।
সেইভাবে হাঁস থাকতে আদৌ পারে কিনা কে জানে?
পরমহংস কল্পনা এক। জল এড়িয়ে বাঁচে যে।
অসম্পৃক্ত থাকা কঠিন—এবং বোধহয় অসম্ভব।

পাহাড়ও নয় অটুট—এবং দেশ-কালই তো নিমিত্ত।
এড়িয়ে এদের জেগে থাকা কেমন যেন কবিত্ব।
অদ্বৈতের চূড়ায় নিবাস ভাবতে ভাবতে ঘুম আসে।
ঘুম যেন এক নিথর অতল আরাম যেন ইঁদারা।

১৯৮৪

সমতা

কী চাই চূড়ান্ত তবে?—প্রভানন্দ?—উষার আকাশ?
এ কোন্ প্রার্থনা?—এর বেশি আর কী আছে চাইবার?
নানা হাওয়া আছড়ায়, ছুঁয়ে যায় হিম ও উত্তাপ
তাতেই মথিত মন। শান্তি তার নয় পরিণাম।

শান্তির সাদৃশ্য যেন শীতের দুপুরে নীলাকাশ
গভীর নিথর নীল, তাতেই নিয়ত ভাসমান।
সুখ নয়, দুঃখ নয়—যেন নিত্য শুদ্ধ হরিদ্বার;
বহতা গঙ্গার ধারা স্বচ্ছতোয়া অনন্ত অবাধ।

'সময়' ছিন্নতা মাত্র, 'দেশ' শুধু খন্ড ও বিভাগ,
'কারণ' কুটিল গ্রন্থি। দেশ-কাল-নিমিত্তে নিবাস—
সে নয় শান্তির স্বর্গ। শান্তি নয় উত্থান-পতন
নয় দীপ্ত অভ্যুদয় ঘটে যার সময়ে বিনাশ।

যা চাই তা নয় কোনো আদি-মধ্য-অন্ত চিহ্নে গতি।
সে শুধু প্রসন্ন বোধ,—সাক্ষী-ভাব,—সমতা-পদ্ধতি।

১৯৮৩

রাত্রি

রাত্রি অন্ধকার।
আকাশে নক্ষত্র-দীপাবলী।
আমি পথ খুঁজি শুধু
অন্ধকারে আপন গহনে॥

তুমি তো আমারই উৎস
বিশ্বময়ী হে নিশাপার্বতী!
বিধিবিধানের সূত্রে
অগম যে শূন্যে নিয়ে যাও,
যুক্তির সহস্র বাহু দিয়ে তাকে
ধরা সাধ্য নয়॥
ওগো ভক্তিতৃষাতুরা,
তুমি জানো, আমিও দুর্জয়॥

অজস্র ধ্বংসের পথে—মায়াবিনী,
ওগো বিজয়িনী,
অসংখ্য মৃত্যুর গুহা ভেদ ক'রে
কোথা নিয়ে যাও?
বলো, কোথা নিয়ে যাও।

রাত্রি অন্ধকার।
কুহকিনী শ্যামা তুমি,
জীবচিত্তে চাও শিবোদয়?

প্রতীক, সংকেত মাত্র।
রূপোজ্জ্বল ঘন ছায়াপথ।

১.১.১৯৭৬

বুকের মধ্যে নদী

পাহাড়ের পরে পাহাড় ডিঙিয়ে নামছে নদী।
ঠান্ডা হাওয়াতে, মেঘে—
হঠাৎ কখনো রোদের ঝিলিক
চা-বাগানে ছায়াগাছে।

বিন্নাগুড়িতে ময়নাগুড়িতে তিস্তাবাজারে
তরাইয়ের জংগলে
বুকের ভারটা মাথার চাপটা হাল্‌কাই হয়
দুপুরে ঝিঁঝিঁর ডাকে।
ডাকবাংলার হাতায় রেন্‌-ট্রি—
তাতে ভোরবেলা 'কা' 'কা' করে দাঁড়কাকে।

কুবো-পাখিটাকে দেখাও যায়না,—শব্দটা ভারি মিষ্টি।
ডাকবাংলার পর্দা পিরিচ পেয়ালা পাপোষ ছাইদান
সব চেনা,—সব। ড্যানলোপিলোর গদিও।
সুখ যেন সেই নিরাপদ ঢল
বুকের মধ্যে নদী।

১৯৮৪

সে এক গাঁয়ে গিয়েছিলুম তেঁতুলতলার পরে—
ফুটি-ফাটা শুকনো মাটি ধানজমিসব জুড়ে।
সাতটি বকের পাঁতি উঠে নিম-বাবলার বনে।
শূন্যে উড়ে হারিয়ে গেল। কী হোলো তারপরে?

তারপরে কী? তারপরে কী? অলস মনের খেলা।
ফেলতেই হয় ঝেড়ে সে-সব। বাড়তে বাড়তে বেলা
রোদ চ'ড়ে যায়,—পৌঁছোনো চাই বেলেতোড়ের মোড়ে
দশটা বাজার আগেই। তাতেই হাঁটতে হোলো জোরে।

হাঁটতে হাঁটতে ঝর্ণা পেলুম। ঝর্ণা সে নয়,—নালা;
ঠান্ডা জলে পা জুড়োলো—তারপরে এক বাঁধ।
বাঁধের পথে চুপ্‌ড়ি-মাথায় দেহাতী তিন মেয়ে—
রঙ্‌-বেরঙের কাঁচের চুড়ি, চুপ্‌ড়িতে লাল শাক।

তারপরে এক পাল্‌কি গেল—হুম্‌ হুম্‌ তার ডাক।
শুনতে শুনতে এগিয়ে পেলুম পথের আর এক বাঁক।

১৯৮৪

অ্যানাবেল লী'র জন্যে

লাল মোজা-পরা বাচ্চাছেলেটা ফুটবলে কিক্ করলো।
একঝাঁক ছোটো পাখি উড়ে গেল আকাশে—
পাঁচ-দশ বুড়ো বসে পাশাপাশি দেখছেই আর বকছেই।
পেয়ারা কিনছে তিন-মেয়ে পথে ডুক্‌রে হাসতে হাসতে।

সন্ধে হবার কতো দেরি আর?—চোখ তুলে ল্যাম্পপোস্টে—
দেখা গেল আলো জ্বলছে এবং ব'ড়শিতে তার ঝুলছেই।
বিদ্যুৎচুরি এইভাবে ঘটে। তাই বুঝি? কেউ দ্যাখে না?
কে-ই ব' দেখবে? খইনি টিপছে হাতে-হাতে কটি ছোক্‌রা।

বেঁকিয়ে বলার কোনো কথা নেই। বানিয়ে বলাও মিথ্যে।
সব অপঘাত সইছে যেমন প্যাচ্‌পেচে কাদা রাস্তার।
ধিক্কারও নয়, চীৎকারও নয়।—মন যার নয় 'চামচে',
তাকেই করেছি প্রেম নিবেদন। কাউকে ধরিনা খাম্‌চে।

রাস্তার পাশে দেয়ালের লেখা ঘোর লাল নীল।
সভা হবে বুঝি? ফেস্টুন নিয়ে হাঁটবে মিছিল।
আমি কোথা আছি?—আমি আজো সেই অ্যানাবেল লী'র
যে কোথাও নেই,—ছিল একজন কবির মনে,
সে নেই বলেই কাটেনা আমার দুঃখের দিন।

১৯৮৪

বনফুল-কে

বলাই-দা, পরমাশ্চর্য শিল্পীর অনন্যতায়
আপনাকে দেখেছি আমরা,
—দেখেছি অনেকদিন।
সময়ের কোন্ বাঁকে ছিল পূর্ণিয়া,
ছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রজীবন—
কোন্ বাঁকেই বা পাটনা,
কোথায় ভাগলপুর—
তারপর এইতো সেদিন এলেন লেকটাউনে।

দিনে দিনে অজস্র রচনা জম্‌লো,
স্থাবর, জংগম, মৃগয়া, কিছুক্ষণ—কে আগে, কে পরে?

কেন আপনার এক নায়িকার নাম 'রাত্রি',
আর-একজনের পিতা 'সূর্যকান্ত', পুত্র 'দিবস'?
অথবা ভন্টুর মুখে সেই 'গ্যান্ঢে',—জটিল লদ্‌কালদ্‌কি,
করালীচরণের দাঁড়কাকটা?
অথবা 'দশভাণ' নাটকের পাত্রপাত্রীরা?
এবং 'শ্রীমধুসূদন' লেখেন যখন,
প্রমথ চৌধুরী, শচীন সেনগুপ্ত, বীরেন ভদ্র—
সবাই প্রেমে পড়েছিলেন আপনার!

সেই 'মৃগয়া' এবং 'লক্ষ্মীর মর্তে আগমন'
আশ্চর্য সব সৃষ্টির মধ্যেই দেখি আপনাকে।
মনে পড়ে, বহ্নিকুমারী-উগ্রমোহনের 'স্বৈরথ' উপন্যাস
—যার নাম দিয়েছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আপনার স্বনামধন্য বন্ধুদের কথা মনে পড়ে—
সজনীকান্ত, তারাশংকর, পটলবাবু, পরিমল গোস্বামী,
কেদার বাঁড়ুজ্যে, কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রভৃতি
কতো নাম!
যখন আপনি লেখেন 'মানুষের মন',
নিজেই বলে গেছেন সেসব দিনের কথা।
শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের জোব্বা উপহার পেলেন,
এবং আজকাল লিখছেন কতো সব ফ্যান্টাসির মাঝেমাঝে
প্রতিদিনের 'মর্জিমহল'!

সত্যেন দত্তের সঙ্গে এই তো সেদিন
গোলদীঘিতে দেখা হয়েছিল আপনার।

শরৎ চাটুজ্জে এক রাগী সন্ন্যাসীর
জাহাজ-ভোজের গল্প শুনিয়েছিলেন
—এই তো সেদিন!

কবে হরিহর রায় মশাই
ছবি আঁকার রঙ তুলি দিলেন আপনাকে—
এবং আপনার প্রথম তেলরঙের ছবিটায়
গাঢ় অরণ্যের স্বল্পালোকিত সব তরুকাণ্ড
দেখতে পাই।

যখন 'রূপান্তর' লিখলেন—
ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা—মরজিনারা বদ্‌লে গেল!

অদম্য কৌতূহলই আপনারা জীবন—
তাই এলো 'ডানা' আর 'নির্মোক', আর 'মানুষ'
আর 'রূপকথা',—এবং 'মন্ত্রমুগ্ধের' ঝানু মল্লিক।

হাসি-কান্নার ঢেউয়ে ঢেউয়ে অরণ্যের পর অরণ্য পেরিয়ে
পাহাড়ে উঠছেন যেন—
'রবিবাসরে'র এই সভার আগে আজই দেখে এসেছি
আপনার এই মুহূর্তের ছবির পট
যাতে পাহাড়ের বরফ ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে
কোথায় উঠে যাচ্ছে পথিক!
এবং আপনার সেই ছবির খাতা—
—যাতে প্যালেটের সব রঙ মিলিয়ে মিশিয়ে
এঁকেছেন অদ্ভুত এক ফিঙে ডি-লিট্‌!

অপনার অজস্র হাসির কবিতার
—ফোয়ারার ঝর্ঝর করতালি শুনছি।
দেখছি, দেয়ালে এখন বৌদির ছবি
তাঁর কপালে সিঁদুর
গলায় রজনীগন্ধার ধপ্‌ধপে মালা।

পৃথিবী ছবি হয়ে যায়, বলাইদা!
কেউ কোথাও ফেরেনা।
শুধু ছবি দেখে যাওয়া পেরিয়ে-আসা বিবিধ দৃশ্যের।
স্মৃতি এক অরণ্যসরণী।

২৮.১১.১৯৭৬

আমি

সরল কোনো বাক্য নয়—
অনেক বাঁকা রেখা।
গাছগুলোর শিয়রে রোদ, আকাশ বেশ ফাঁকা।

মনে হচ্ছে থেকে-থেকেই চেতনা আপতিক—
যদিও কেউ আছেই আছে ফুল ফোটার মতো,
মাটির রস নিয়ে বর্ণ গন্ধ রচা ব্রত।

মনে হচ্ছে, আমার কোনো মানেই যদি নেই—
তাহলে কেন কবিতা? কেন গান?
তাহলে কেন উজ্জীবন?—পূর্ণতার আশা?
তাহলে কেন যুক্তি? কেন বিচার? কেন ভাষা?

ভাবের এই দোলাটা যেই ভেতরে দেয় হানা—
তখন আমি একাই হই মানুষ নানাখানা।

১৯৮২

এই সময়

পথ হাঁটা হোক্ আস্তে আস্তে সাবধানে।
রাত্রি বড়োই বিপজ্জনক এদিকটায়—
আলো জ্বলছে না, ছুরি খরশান
কে কোথায় আছে লুকিয়ে!
ঠাণ্ডা গভীর ফলকটা দেবে
বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে।

সময়ের জল মিশ্‌কালো, আর
আকাশে মেঘের গর্জন।
বিদ্যুৎ দেয় ঝিলিকে দু'চোখ ধাঁধিয়ে।
বাতাস এখানে স্তব্ধ নিথর,
কখন যে দেবে কাঁদিয়ে।
মৃত্যুর গুহা যেখানে-সেখানে—
দেয়না বুজিয়ে বাঁধিয়ে।

কোনোদিকে নেই দৃক্‌পাত কারো
নালিশ শুনবে কেই-বা?
নিজেই নিজেকে সাম্‌লাতে হবে,—তাছাড়া
কোথায় মিলবে সদাসতর্ক পাহারা?
রাত্রি বড়োই বিপজ্জনক, হুঁশিয়ার।
প্রাণটা তুচ্ছ, ছুরি-ছোরাগুলো ক্ষুরধার।

১৯৮৩

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে

নিত্য ছিলে দেদীপ্যমান বিদ্যাতে ও বুদ্ধিতে
বাইরে থেকে মনে হোতো ছিলে অটুট ফুর্তিতে।
স্মৃতিও নিষ্কম্প ছিল। নানান্ কবির কবিতা
যখন-তখন শুনিয়ে দিতে শিরোনাম ও ভণিতা।
কোন্ কথা কে বলে গেছেন বল্‌তে খুশির ঝলকে,
আজ তুমি নেই? অবিশ্বাস্য! পড়ছি মনের ফলকে।

১৯৭০

এটাই সম্ভবত আমার শেষকথা মশাই, শুনছেন?
হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি,—যিনি গুহাহিত সাক্ষীমাত্র।
এই খুনের রাজনীতি, কালো টাকার ঝন্‌ঝনানি,
সংঘবদ্ধ বলাৎকার এবং ব্যক্তিগত গীতবিতান
যদি মায়ামাত্রই হয়,
তা'হলে?

তাহ'লে আমি অপারগ আপনার সঙ্গে কথা চালাতে।

উপসাগরীয় ব্যাপারট্যাপার কিংবা
ব্যক্তিগত অথবা আন্তর্জাতিক রাসলীলা—
শিশুবর্ষের উৎসব এবং পারমাণবিক সন্ত্রাস
এবং ইলেকট্রনিক্‌সের বিশ্বরূপ ইত্যাদিতে
আপনি আমার হৃদয়হরণ শ্বেতাশ্বতর।

খুব মেঘ করেছে এই বর্ষায়।
দিনরাত 'মেগাওয়াট' 'মেগাওয়াট' শুনতে হচ্ছে।
দেয়ালের টিক্‌টিকির মতন টিক্‌ টিক্‌ করছেন আপনিই।
আমার মধ্যে আপনিই।
আপনার মধ্যেই বিশ্বজগৎ।
বিরোধগুলো মেলাচ্ছেন কোন্‌ আকাশে?
আমার জাগরণে যায় বিভাবরী।

১৯৮৩

উড়ুক্কু হাওয়া আসবেই—ধুলো ওড়াবেই—পাতা ছড়াবেই।
ট্রেনের জান্‌লা থেকে দেখা দূর দিগন্ত
ছুটে পালাবেই।
কিন্তু তা নিয়ে যন্ত্রণা যাই হোক্ না—
ঘ্যানর ঘ্যানর করার যন্ত্র
—এ মিঞা তেমন লোক না।

একথাটা কহতব্য যে, ক্রমে সবি স'য়ে যায় সময়ে—
যেমন মাজাটা ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে
মাথাটাই যায় এগিয়ে—
বুকে চাপ ধরে হাঁটতে—
ইচ্ছে করেনা নিজেই এগিয়ে
মায়ার রজ্জু কাটতে।

হঠাৎ কবে যে হুড়মুড় ক'রে শেষগাড়ি এসে পড়বে—
মিথ্যে সে-চাপ জমানো,
বাড়ানো মিথ্যে।
পাদানিতে তোলা, ভেতরে প্রবেশ,
খুলে মেলে রাখা দরজা
তারই দায়িত্ব, তারই দায়িত্ব শেষটা।
উড়ুক্কু হাওয়া ঠেলবেই ঠিক—
ঠেলবেই।

১৯৮৪

এইসব দিনরাত

এইসব দিনরাত, আমোদ প্রমোদ,
ছুটে-চলা ভেসে-যাওয়া উড়ে উড়ে
বিহঙ্গবোধ—
যা কিছু শোণিতস্রোতে রেখে যায়
দোলার চমক,
গানের মীড় ও যতি
হৃদয়ের দমক গমক—
সমস্ত ঢেউয়ের পারে আছে এক
নির্বাক স্থির।
মথুরা যতোই কাছে ধেয়ে আসে
জাগে সেই দিক॥

জীবনের সঞ্চয় নয় কোনো স্থায়ী আমানত।
কেবলি পড়ছে জমা, ঘটছে খরচ।
এই ধারণার চির-তাড়নায় সুখের ভ্রমণ।

ট্রেনটা যতোই ছোটে—
মনে সেই সুখের স্মরণ,
লহরী লহরী শুধু—
হাওয়ায় দুলছে কাশফুল।
জানিনা সুখেরা সব সুখ, নাকি—
কুহক না ভুল।

১৯৭৪

['ইদানীং আমি'-র 'প্রেমকে' কবিতার আদিরূপ এটি]

ভোগ

চিরদিনই কর্তাব্যক্তি ভূমিকায় বিভোর থেকে সে
বানিয়ে তুলেছে এক আত্মবোধ যা ক্রমশ হাওয়া।
তিরিশ চল্লিশ সাল আগে তার ছিল যে আত্মতা,
বছরে বছরে ক্ষ'য়ে পরিণামে নিরুদ্দিষ্টতা।

অদ্ভুত ব্যর্থতাবোধ আক্রমণ করে মাঝে মাঝে।
বুঝেছে কিছুই তার ইচ্ছের আঙুলে ধরা নেই।
যা-কিছু রচনা সবই নৈসর্গিক, স্বতোভূত যেন.
ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে ঘটেছে সে নিজেও. নতুবা—

কেন সে স্বেচ্ছায় কোনো অবাক মেঘের ঝুঁটি ধ'রে
হারাতে পারেনা আর যেমন সে উড়তো আকাশে
ঝড়ের সংগে ঝড়, বিষ্টির সঙ্গে বিষ্টি হয়ে—
ইচ্ছাধীন ছিল তার ভাল থাকা, আর সুখী হওয়া।

১৯৮৫

এই যে সময়—ঠাণ্ডা সময়,—দিন ছোটো, রাত লম্বা
ইচ্ছে করে মানবজমিন আবাদ করি সত্যি।
গ্রেনাডা আর লেবানন আর হাট্টিমাটিম নামরা
জোট-নির্জোট হেডলাইনের রোজ সকালের চীৎকার—
চোখেও যেন দেখতে না হয়, কানেও না হয় শুনতে।
কিন্তু ভারি অবাস্তব এই পালিয়ে যাবার ইচ্ছে।

অগত্যা সব থাক,—আমি যাই চরণ কিংবা গড়িয়া—
খানিকটা পথ হাঁটতেই হয় হাটের ধুলো শুঁকতে।
ফুলকপিদের আশেপাশেই গাজর মটর সব্জি
টোম্যাটোদের সবুজ-লালে থাকতে নজরবন্দী
কী ভালো যে লাগে আজো এই বেহায়া মনটার
আপনি যতোই করুন না রাগ, যায়না স্বভাব মরলেও।

নেহাৎ সে কোন্ গহন ঝোঁকে শাহআলম্ নামটা
হঠাৎ জাগে বুদ্বুদপ্রায়,—আওরংজেব,—শিব্জী
ঝাপ্শা সে-সব আগুনপ্রমাণ মোগল এবং বর্গী,
কালের গতি এইরকমই—তাইতো বলে বুদ্ধি।

ব্যক্তিগত ব্যাপারট্যাপার সত্যটত্য চিন্তা—
নরম তুষের ছোঁয়ায় যখন তাপ দিয়ে যায় রোদ্দুর,
তখন আমায় ঝিম্ করে দেয় দক্ষিণায়ন-পর্বে।
প্রেমের চেয়ে জোর নেশা এই দিন ছোটো, রাত লম্বা।
ইচ্ছে করে সজ্ঞানে যাই অন্ধকারে তলিয়ে—
আপনি যতোই বলুন একে বাহাত্তুরে বুদ্ধি।

১৯৮৩

জিমি ও আমি

জিমি দেখলেই চিনতে পারে,
জিমি চিনলেই ডাকে।
রোদে-বিষ্টিতে সমান ফূর্তি,
জিমি ঘেউ ঘেউ হাঁকে।

জিমি বিস্কুট খায় হাত থেকে, তাই—
আমিও জিমিকে সহজেই খুঁজে পাই।

এই চাওয়া-পাওয়া যৎসামান্য—
যার যা সাধ্য,—নমস্কার।
জিমি বেঁচে থাক্, জিমি বেঁচে থাক্—
এছাড়া কী-ই বা চাইবো আর?

১৯৮৪

বাদ-প্রতিবাদ

প্রিয় ছবি সব পকেটেই ছিল—পকেট কেটেছে চোরে।
সময় বদ্‌লে যাচ্ছে, যাবেই,—যাক্‌।
আজকাল কিছু ভাল লাগা দুর্ঘট।

বেলকুঁড়িগুলো পুড়ছে গাছেই। বুকের কাছেই তা।
বিদ্যুৎ নেই, শাসন তামাদি, খাচ্ছি যা জোটে তা।
কোনো গলাতেই ফুটছে না সুর। আসছেই ঝঞ্ঝা।

জামরুলতলা পেরিয়ে সেই যে টল্‌টলে জলময়
একদা প্রেমের গাহন ছিল সে নৈসর্গিক সুখ
বৃথাই গিয়েছে বল্‌লে কিন্তু কিছুতেই মানিনা।

১৩৯০

অপরিণাম

না, আমি কোথাও শেষ বাসা-বাঁধা পাখি তো দেখি নি,—
তবে,—
কোনো-কোনো দিন কী আশ্চর্য ইচ্ছেরা
এসে পড়ে।
খুব ভোরবেলা সিঁদুরে মেঘের
বড়ো বড়ো ছড় ছুঁয়ে
হাওয়া উড়ে যায় কোথায় উধাও হয়ে।

'সত্যি বলছি, দুধের গাড়িটা রাস্তায় উল্টেছে'—
ঝিয়েরা বল্‌ছে ইল্‌শেগুঁড়িতে ভিজে।
ছাগল-তাড়ানো বিষ্টি তখন লাগলোই ফিন্‌ফিনে।
গিন্নিরা ফোঁশে,—বলে তো ঝিয়েরই দোষে।

নদী বা পাহাড় যা-হোক্, তা হোক্—স্ত্রী-পুরুষে টান, তাও—
কিংবা দুঃখু কিংবা ফুর্তি—সবই
রক্তসন্ধ্যা-আলোয় প্লাবিত নির্জন খাদে যেন
হাজার হাজার কালকেউটের খেলা!

না, আমি বিশ্ববীজ বা সূর্য জ্যোতির্ময়কে পেয়ে
ধন্য হয়েছি—বল্‌তে পারিনি তাই।

১৯৭৭

নির্বাপণ

[এক]

চিঠি লিখছি নিজেকেই উনিশ-শ'-চুরাশির এই
অক্টোবর, একত্রিশ তারিখে।
চোদ্দই কার্তিক, বাংলা সাল।
সকাল নটার ঠিক ক'মিনিট পরে তা জানিনা
মর্মান্তিক ভবিতব্য ঘটে গেছে নতুন-দিল্লীতে।

রেডিও-তে নম্র বাজনা, চূড়ান্ত সংবাদ নেই বটে।
সকলেই বুঝে গেছে কী ঘটেছে।
বিহ্বল বিষাদে।
উনিশ-শ' আটচল্লিশ ফিরে আসছে অনেকের মনে।

কেন চিঠি লেখা? কেন আবেগে মথিত হয় মন?
রাজনীতি? ষড়যন্ত্র? নিয়তির নির্মম হরণ?
মাত্র রাজনীতি পারে এরকম নিষ্ঠুর হনন?
ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু অদম্য প্রাণের নির্বাপণ।

আজ-কাল-পরশুর শোক রোষ আশংকার পরে
থিতোবে উদ্বেল জল। মন্ত্রিসভা-সংস্কার হবে।
থাকবে আকবর রোড়, সফদরজংগ।
থাকবে কুতুব, থাকবে তিনমূর্তি-ভবনের স্মৃতি।
চিঠি লিখচি কেন? কেন যন্ত্রণার ঘটছেনা ইতি?

ফুল, রক্ত, শান্তিবন—
অদম্য প্রাণের নির্বাপণ।
বারবার দুর্বোধ্য নিয়তি।

[দুই]

ধাক্কাটা এলো যেন আকাশের বজ্র।
জান্‌লা ভাঙলো, দরজা ভাঙলো,
—পাহাড় পড়লো সাগরে।
লেনিন যখন মারা যান
ছিল ট্রট্‌স্কির কথা তাই না?

ভালমানুষেরা ভয়ে জড়োসড়ো,
বুড়োমানুষেরা স্তব্ধ।
হৃদ্‌রোগে হোলো কেউ কেউ শেষ,
আত্মনিধনে কেউ বা।

শান্তিবনের চন্দনচিতা,
সারা দুনিয়ার মাথা-মাথা নেতা
দূরদর্শনে লক্‌লকে শিখা দেখলুম।
বুলেটে বিদ্ধ প্রিয়দর্শিনী
ছাই হয়ে হন ভারতজননী।
হিমগিরিলীনা ভবিষ্যপ্রবাহিণী।

ব্রোন্‌জে, পাথরে, কতো পটে, কতো রচনায়
থাকবেন তিনি, থাকবেন।
সত্তর কোটি মানুষ বেবাক।
কাকে বলে নিরাপত্তা?

১৯৮৪

স্মৃতি

রোদে জ্বল্‌জ্বলে রক্তকরবী
সারি সারি তারা।
পাহাড়তলীর গাঁয়ে কার বাড়ি
আলো করেছিল,
দুপুরে উদাস ঘুঘুর ডাকে সে
সময়ের স্রোত
ভাল লেগেছিল।

এবং সেসব অভিজ্ঞতার
মানে খোঁজবার
অণুমাত্রও ইচ্ছে ছিল না।
শুধু দেখবার
মেজাজে হৃদয় ছিল ভরপুর।

এখন যখন সে-সকল রূপ ক্ষণে চমকায়,
কেন যে হৃদয় করে হায়, হায়!

১৯৭৪

চা-সুন্দরী

[শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রিয়বরেষু]

কাঁটাগাছে ঘেরা বেশ ক'মাইল,—বৃহৎ হাতায়
পিঠের ঝুড়িটা ভরে মেয়েটার চায়ের পাতায়
থ্যাবড়া নাকের দু'পাশে গালের কটা রঙে তার
চাবুকের দাগ। কেউ মেরেছিল। আজ তা বাহার।

১৯৭৪

সুরধাম

[ডলি-কে]

ধান, ধান,—সবুজ ধানের গান আশ্চর্য রোদ্দুরে,
বুড়িগংগায় বরিশালের জাহাজ,
সদরঘাটের ঢালুতে নামতে নামতে শোনা গেল
কেউ বল্‌লে—'আর কি ফেরা হবে এখানে?
—কোনোদিন,—আর কোনো দিন?'

অশথের কচিপাতায় ছেলেবেলার সুখ বুঝি!
ভোরের পুরানাপল্টনে রঙবাহার রিক্‌শ সব।
বুকের মধ্যে হাওয়া, আমার হাওয়া!
সব ভালোবাসাই সীমার অতীত কিছু পাওয়া।

সমস্ত অহংকার আর মূঢ়তার মেদ ঝরিয়ে দেয় সময়।
বংগোপসাগরের ঢেউ আর আকাশ কেবলি।
তারপরেই কর্ণফুলীর মোহানা-ছোঁয়া চট্টগ্রাম।
বিশাল চিল যেন ছোঁ মেরে ধ'রলো কিছু।
ভেতরটা সুরধাম।

১৯৭৪

শক্তি

একটা ঝুলবারান্দার রেলিঙের পরে রেলিঙ্—
আকাশ উল্টে পড়েছে তার ওপর,
হুহু ক'রে মেঘ উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়া,
বিশাল অশথের উপর ঝাঁপিয়ে নামলো বিষ্টি।

এক-একদিন শিউলিবনের রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটা।
সময়ের মাপজোক থাকে না।
কর্ণসুবর্ণপুর, ধৌলি, সরস্বতী এবং আরো সব
          নামের মধ্যে নাম।
     —সেখানে কেউ কোথাও নেই।

ভালোবাসার সংস্কৃত হয়না, বন্ধু।
গন্ধ, স্পর্শ,—ঘামের মধ্যে ঘাম।
অবসাদের ঘোড়ার পিঠে দশভুজা;
     চাবুক আর লাগাম।

১৯৮৩

['ইদানীং আমি'তে প্রকাশিত এই কবিতার আদিরূপ শারদীয় আনন্দবাজার ১৩৮৩ থেকে এখানে পুনরুদ্ধার করা গেল]

কার জন্যে লেখা এসব আবছা মনের ভাবনা
নিমগাছটার লালচে কচি পাতায় রেখে চক্ষু
কিংবা সোনায়-নীলে আঁকা টিপ্‌পোকাটার ভঙ্গি
দেখতে দেখতে কী দেখা যায়?—কী যুক্তি? কোন্ বিশ্বাস?

কনফুশিয়াস ব'লেছিলেন, বুদ্ধিটা হোক্ স্বচ্ছ;
কোপার্নিকস ব'লে গেছেন—পৃথিবী এক বিন্দু!
বিশ্বআকাশ অপরিসীম, নয় বাহারে ক্যাকটাস।
প্রেম আমাদের বুদ্ধির দোষ, মন আমাদের জংলা।

মনীষীদের জীবনকথায় সার্থকতার রাস্তা
খুঁজছি না কি? খুঁজছি না কি?—পূর্ণিমা-চাঁদ উঠলে
সুরেলা কেউ থাক্ বা না-থাক্, সাধ জাগবেই 'সত্যে'র
যদিও তা অস্থায়ী,—তা সময়বীণার ঝঙ্কার।

কার জন্যে বেঁচে আছি? নিজের জন্যে,—অর্থাৎ
প্রাণ ধারণের মূলেই এসব উচ্চারণের ইচ্ছে।
অদ্বৈতের রূপ দেখিনি,—রূপেরই 'নাম শব্দ।
পুরুষ হলেই সঙ্গিনী চাই, স্ত্রীলোক হলেই সংসার।

টিপ্‌পোকাটার ঝক্‌ঝকে নীল স্বর্ণশোভার বাইরে
টিপ্‌পোকাটার অনন্য রূপ যাবেই যাবে হারিয়ে।

১৩৮২

['ইদানীং আমি'-তে এই কবিতা 'টিপপোকা' নামে ছাপা হয়। এখানে মূল নামটিই ফিরলো]

টুকরো

সারাজীবনটা মনেই পড়েনা একযোগে।
যা মনে পড়ে তা টুকরো।
টুকরো টুকরো ঘটনার ঘোড়া ছুটিয়ে
যাদুকর এক অবাক নিশেন উড়িয়ে
যেন চলে যায় বহুদূর—কতোদূর তা
কোন্ ফিতে দিয়ে কীভাবে যে পরিমাপ্য
মন নিজেও তা জানেনা,—জানেনা একদম।
কিছুটা গভীর, কোথাও বা কিছু উচ্চ,
কিছু সাধারণ তুচ্ছ।
সমান ওজন নয় প্রত্যেক অংশের।
সৃষ্টির কাল যতোটা, নয় তা ধ্বংসের।

সারাজীবনটা কে-ই বা দেখতে সক্ষম?
কার মনে পড়ে নিজের জন্মলগ্ন?

মানুষের ঘরসংসারে প্রিয় গন্ধ
বিছানা-আলনা-বইপত্তরে-বাসনে
পুনরাবৃত্তি, পুনরাবৃত্তি কেবলি।

কিন্তু পুরোনো হচ্ছেনা যা, তা দিন-রাত—
যেন ফুল, যেন ভালবাসা, যেন মৃত্যু।
কে-ই বা জেনেছে কাকে বলে স্থির সত্য!
শুধু হওয়া, শুধু বীজ ফেটে হওয়া অঙ্কুর,
অঙ্কুর থেকে পুনরায় পরিণতিতে—
ঝরে যাওয়া শুধু অশেষে।

১৯৭৭

ছায়াতরুর নিচে

নিম-বেল-বট-যগ্‌গিডুমুর উঁচু পাঁচিল ঘেঁষে।
ঠাণ্ডা ছায়ার পথ গিয়েছে পাশেই এঁকেবেঁকে।
সেই পাঁচিলের ওপারে মাঠ, গাছগাছালির ফাঁকে
হাসিখুশি ছেলেমেয়ের হল্লা বেঁচে আছে।
পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে গায়ে, চপ্পলে পা দিয়ে—
বিকেল হলেই পায়চারি সেই মস্তো মাঠের দিকে।

কুবোপাখির ডাক শোনা যায়, ঘাসে শিমুলতুলো।
লিচুর কুঞ্জে মঞ্জরী নেই, বাতাস ওড়ায় ধুলো।
বিধানসভায় গুমোট বাড়ে, সংসদে বেশ জ্বালা—
শিক্ষাসংস্কারের কথায় বিষামৃত ঢালা।
গুলঞ্চফুল ঝাঁক বেঁধেছে, হালকা সুবাস তাতে,
সবুজ কচি পাতার বাহার প্রাচীন অশথগাছে।

সেই নিরালায় প্রায় বসা হয় ছায়াতরুর নিচে।
বকের পাঁতি তীরের মতন উধাও আকাশ চিরে।
রঙ্‌ বদ্‌লায় আলোর, শুনি উপনিষদ্‌কথা—
কোনোদিন-বা কথামৃত, কোনোদিন-বা গীতা।
কোকিল ডাকে ক্ষণে ক্ষণে,—আত্মউপমাতে
দুঃখে-সুখে সমতাবোধ তেমনি মধুর লাগে।

ঢিলেঢালা ভাবের হাওয়ায় জীবনরহস্যটি।
শেষবেলাতে কে-ই বা নেবে অহমিকার ঝুঁকি?
দম্ভ-মোহ-কাম-ক্রোধ-লোভ প্রমাথী ইন্দ্রিয়।
তাদের কঠোর তাড়নাতে ক্রমেই বীতস্পৃহ।
সুদুষ্কর সেসব বায়ু প্রজ্ঞাতে রোধ করা।
কুবোপাখির আওয়াজ কি যায় রঙতুলিতে ধরা?

সূর্য নামে অস্তাচলে, দক্ষিণে যায় উড়ে—
এরোপ্লেনের ভ্রমরধ্বনি,—দেখি দু'চোখ তুলে।
বিশ্বময়ী আছেন জেগে,—তাঁর অপরূপ মায়া।
ত্রিগুণী সেই আড়াল থেকেই দেখি যে-যার ছায়া।
'তংখাইয়া' ক'রে সকল উপদ্রবের গুরু
প্রাণের ছবি ফিরে দেখার রাত্রি হোলো শুরু।

১৯৮৫

ডিজাইন

[পুলিন-কে গায়ত্রী-কে]

শাদা মেঘের টুকরো জমছে।
ছড়িয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।
আকাশ গাঢ় নীল হচ্ছে বারবার।

রোদ লতিয়ে এলো সবুজ মেঝেতে
শাদা-কালো মোজেকের ছিটে।
মাধবীলতার কালো ছায়া কাঁপছে তাতে।

রোজ সকালেই এইরকম ম্যাজিক ঘটে আজকাল।
উজ্জ্বল রোদ্দুরের মধ্যেই এইরকম ছায়া এসে পড়ে।
যাকে দেখা যায়না, সেই পাখিটা ডাকে চিক্‌চিক্‌ চিক্‌চিক্‌।

আর-একটু সন্ধানী হলেই ঘটনাদের শিকড়ে পেঁছোনো যেতো।
সমস্ত রূপই উপাদানে বিশিলষ্ট হয়।
আর-একটু নিস্পৃহ হলেই আকাঙ্ক্ষারা বিবরণ হয়ে যাবে।

১৯৭৮

পরিণামে

নিজেকে নিয়ে উতলা থেকে মুখে বলেছি 'হরি—
বাঁচান যদি তবেই বাঁচি, মারেন যদি মরি।'

ঝড়ের মুখে কখনো সব ভেঙেছে দাঁড়, হাল—
শিব-কে জানি সংহারক প্রবল মহাকাল।

ব্রহ্মা বুঝি চতুর্মুখ, বিষ্ণু দয়াময়!
মনে বেজেছে মনের কথা—'আমি-ই অক্ষয়।'

'গৌর-নিতাই', 'গৌর-নিতাই' মুখের বুলি শুনে
হিসেব রাখেন অন্তরে কেউ সবই রাখেন গুণে।
অঙ্ক ক্রমেই নথী-পুঁথির সীমানা পার হ'য়ে
মহাকাশের বিস্তারে যায় ছড়িয়ে শূন্য হয়ে।

এই দেহ-মন রূপান্তরের পর্বে পর্বে ক্রমে
দেখতেই পায় নিজের কালি, তথাপি বিভ্রমে
মায়াবিনীর গলার আওয়াজ সেতারে রিন্‌রিন্‌
বাজছেই তার বুকের মধ্যে, এমনি মায়ার ঋণ।

যায় সরে যায় সব সংসার, মন্দির ও বিগ্রহ।
পরিণামে 'আমি' নহি—'তুমি'ই রহো, রহো।

১৯৮০

তিনটে টিয়া

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নেহাস্পদেষু]

তিনটে টিয়ার বাড়ি এক পাহাড়ে—
বাড়ি নয়, বাড়ি নয়—কোন্ গুহাতে
ফিরে যায় প্রতিদিন সন্ধে হলে
সারারাত চুপ্‌চাপ থাকে সেখানে?

খুব ভোরে দেখি তারা বৃহৎ বটে
পাতায় ঠোকর দেয়, কখনো ফলে,
একা একা আমাদের উঠোনে নেমে
ভিজে ছোলা খেয়ে যায় চায়ের প্লেটে।

কখনো খায়নি তারা চপ-কাটলেট
দেখেনি কেমন খেলা হকি বা ক্রিকেট
খাঁচা পাতা আছে, তবু দেয়না ধরা
ভবঘুরে পাখিগুলো আকাশ-চরা।

১৩৮৪

ছন্নমতি

এক

চিতোরে উদয়পুরে একে-একে পাহাড় পেরিয়ে
ঢালু ধু-ধু মাঠে-মাঠে চিকন সবুজ শ্যামাঘাসে
চড়ুই, তিতির, ঘুঘু—সকলেই ছিলুম, ছিলুম।

'ভীমল' নামের সেই একফোঁটা স্টেশনে দুপুর।
দর্পণে যা-কিছু ধরে, দর্পণের কিছুই তা নয়।
যে পেয়েছে সে-ই জানে পলাতক বিষয়আশয়।

কখনো ভুলবো-না তবু 'গম্ভেরা'-নদীটির নাম
ইঞ্জিনের ভ্যাঁশ্‌ভ্যাঁশ্‌—আকন্দ মনসার ঝোপে
প্রজাপতি উড়েছিল যেমন ওড়েই চিরকাল।

দুই

ভালোলাগা অবশ্যই চাই বেঁচে থাকার জন্যেই
একথা সবাই বলে, গাছ বলে, মাছি বলে, আর—
পাখি, পোকা—যে-ই হোক্‌, এ-বিষয়ে নেই ভিন্‌মত।

অথচ দুনিয়া কী যে ছন্নমতি, কী যে উদাসীন
কিংবা মানুষ ছেঁচে নিজেকেই হামানদিস্তেতে
আলাদা আলাদা হয়ে জমাবেই বিষয়আশয়।

প্রেমের গল্প বা গান, কবিতা বা সেসব নাটক
যেমন চিত্রাঙ্গদা, যেমন বিদায়-অভিশাপ—
কিছুই টানে না কোনো ধুরন্ধর বিষয়ী ব্যক্তিকে।

১৯৮৩

নানা খাতে বহে যায় উচ্ছল বৃষ্টির জল মাঠে
সেচের ক্যানালে রাঙা জল।
নীল নীল রেখা এ'কে দ্রুত মুছে মাছরাঙা ওড়ে
ধানের সবুজ শ্যাম অনেকটা। গ্রাম দূরে দূরে।
প্রকৃতির এই শোভা বছরে বছরে ফিরে আসে
বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো দরজায় পে'ীছেই কড়া নাড়ে।

হলুদ ঘাসের ফুল—লাল, শাদা; নয়নতারারা।
এইখানে রক্তজবা, ঐ কোণে বেগুনি ফুরুশ।
ঝিঙেফুল, মানকচু, পুঁইলতা, কাটোয়ার ডাঁটা।
আবদুলের মুরগি চরে। জমি তার আট-দশ কাঠা।
তারপরে বাঁশবন,—আরো পরে রেললাইন, মাঠ।
অন্ধকার ভারি জল হরিহর রায়ের পুকুরে।
তারপরে সারি সারি টানটান টেলিগ্রাফতার।

কৃষ্ণকলি যাকে বলে, সন্ধ্যামণি তারই নাম কিনা
জিগেস করেছি যাকে সে বলেছে, 'সে আমি জানিনা।'

জানার উপায় নেই মায়ায় রয়েছি অজানায়।
সন্ধ্যা আসে অগোচরে, আকাশের আলো নিভে যায়।

১৯৭৮

সাধু-সন্ত

[শ্রীসোমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী-কে]

ভেরাবল ইস্টিশানে বিশ্রান্তি-আবাসে এলো জ্বর,
বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখা গেল ডালিমের ফুল—
বাদাম, নারকেল গাছ, পিটুনিয়াঝোপে ছোটো পাখি।
বিকেল তিনটে বাজলো। চা-পানেও বেজায় অরুচি।
গেলুম বেরিয়ে পথে ছিলই না চেনাজানা কেউ,
সেরকম নিরিবিলি জীবনে কদাচ পাওয়া যায়!

উঠলুম মোটরবাসে, কখন যে কুম্ভারওয়াড়া
পেরিয়ে বাঁদিকে বেঁকে সমুদ্রের দিকে যেতে যেতে
হঠাৎ শুঁটকির গন্ধ নাকে এলো,—ডাইনে মাস্তুল
সে যেন বল্লম উঁচু,—সন্ধে হোলো কী জানি কোথায়!
ময়লা মেরজাই-গায়ে 'খেড়ু'-চাষী বিড়ি টানছে ক'ষে।
নামলুম তাদের সঙ্গে,—সে আমার প্রথম সোমনাথ!

বারবার ধ্বংস হয়ে শিবলিঙ্গ রয়েছে এখনো,
শ্বেতাঙ্গিনী পার্বতী ও সিংহে-চড়া আম্বাজী—এবং
মর্মরে ত্রিপুরেশ্বরী! মনে পড়লো দিলওয়ারা হঠাৎ।
হিরণ, কপিলা আর সরস্বতী মিশেছে সঙ্গমে।
ওপারে তিনটে উট, অনেক আশ্চর্য শাদা হাঁস।

এপারে তর্পণ সেরে 'হাতী গিরি' বল্‌লেন বাংলায়
পূর্বাশ্রমে তাঁরই নাম ছিল কবে দীপক গাঙুলি।
এরকম কিছু কিছু সাধু-সন্ত দেখেছি, যেমন—
কাশীতে এলাহাবাদে বানপ্রস্থে কৌশলেশ দাস।

তারপর বাল্‌কাতীর্থে গিয়ে দেখি কৃষ্ণ আর ব্যাধ।
ইন্দোরের সাধুটির মণিবন্ধে ইলেকট্রিক ঘড়ি।

১৯৮০

প্রশ্ন

আমি অরণ্যের খোঁজে মাঝে মাঝে দিক্‌চক্রবালে
নিজেকে হারাতে পারলে
কী অসীম সুখের প্রহর
সঞ্চয়ের খাতে তুলে,
এ-জীবন সার্থক করতুম;

আমি সমুদ্রের দিকে উদ্দীপনা সবলে বহালে
অতলে অথবা দ্বীপে
আজো মনে হয়—পৌঁছোতুম!

কোথাও যাইনি মানে, যাওয়া হয়নি,
আছি দেশ জুড়ে—
অন্ধকার অবিশ্বাস ছায়াময়
বিশাল শরীরে।
শরীরসর্বস্ব জন্তু পঙ্গু ও স্থবির।

আমাকে প্রবল ঝড়ে ধন্য ক'রে হয়তো সময়
অরণ্যে সমুদ্রে দ্বীপে
একমাত্র নিশ্চিহ্নতা-গুণে
নিজেও নিশ্চিহ্ন হবে। তারপরে হে সময়,
মঞ্চে কি মানবমন
দেখা দেবে অন্য ভূমিকায়?

১৯৬৭

নীল দোপাট্টা

[ডাক্তার নির্মল সরকার, প্রিয়বরেষু]

একটি রাস্তা স্বপ্নে আমার ঘুরে ঘুরে আসে,—তাকে
খুঁজেও মেলেনা কাজের ব্যস্ততাতে।
পপ্‌লারবীথি-শিরে নীলাকাশ, ডাইনে খুশির নদী,
সামনে চড়াই ওঠে বরফের গাঠে।

রোদে ঝক্‌ঝকে পাহাড়ের চূড়া,
পাকদণ্ডিতে উঠছে মেয়েরা—
রাঙা ঘাঘ্‌রার ওপরে তাদের নীল দোপাট্টা ওড়ে।
ঘাসের সবুজ ছিট সে-পাহাড়ে—
যেখানে গরুরা চরে।

১৯৮৪

হো-চি-মিন

[শ্রীনিখিল সরকার, প্রিয়বরেষু]

কাম্পুচিয়ায় আমি আজো যাইনি,
সেইখানে রাজধানী নমপেন।
ভিয়েতনামেও আমি যেতে পারিনি,
দক্ষিণে কীর্তিত সায়গন।
উত্তরে আছে তার হানয় শহর,
ইন্দোচীনের নয় বিশাল বহর।

অভেদ্য দুর্গ সে দুই-মুলুকেই
গর্ণানধনের খেলা মার্কিন ও চীন
খেলেছে বটেই, তবু বদ্‌লালো দিন।
সায়গন হোলো 'হো-চি-মিন'।

১৯৮৪

Indian Institute of A... ...d Study
ACC NO. 111653
DATE 26/6/03
SHIMLA
72

তীক্ষ্ণ শব্দবোধ ও অভ্রান্ত ছন্দ-দক্ষতাতেই শুধু উজ্জ্বল নন হরপ্রসাদ মিত্র, তিনি সেই বিশেষ মেজাজে চিহ্নিত, যে-মেজাজকে বলা যায়, বহতা বিশ্বসমাজের মধ্যেই শান্ত আত্মনিরীক্ষা। মৃদুকণ্ঠ তবু বিশিষ্ট এই কবির বিস্ময়ে, বিষাদে, বিদ্রূপে উদ্‌ভাসিত একগুচ্ছ নতুন কবিতা নিয়ে এই সংকলনঃ 'ছবি ফিরে দেখা'।

ছবি ফিরে দেখা, কিন্তু তা বলে, কালের বিরুদ্ধ স্রোতে ভেসে লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধার নয় এই কবিতাগুচ্ছ। কালের উজান স্রোতে ভেসে-আসা, পরিণতির মোহনায় পৌঁছে-যাওয়া এই কবি সেই ছবিই ফিরে দেখতে চান, যা কিনা তাঁর মর্মে প্রতিফলিত হয়ে মুহূর্তকে রূপান্তরিত করে অনন্তের প্রতিমায়। আকাশ, সময়, প্রেম—এই তিন শব্দের মধ্যেই বিধৃত তাঁর রূপানুরাগ ও মৃত্যুবোধ, সংশয় ও প্রত্যয়ের জলতরঙ্গ। এ-বইয়ের কবিতাবলীতে একদিকে তাঁর নৈসর্গিক ভ্রমণপঞ্জী থেকে তুলে-আনা গভীর রেখাময় ছবি, অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবন-পর্যটনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার সারাৎসার পাঠককে ক্রমশ পৌঁছে দেয় এক ভিন্নতর ভুবনে। যে-ভুবন একান্তই হরপ্রসাদের।

Library IIAS, Shimla
B 891.441 8 M 697 C
00111653